OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 217 - 225
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প : জীবন ও বাস্তবতা

দিব্যেন্দু বেজ
Email ID : dibyendubej1404@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
life and values, existence, humiliation, complication, economic hardship, middle class.

Abstract
The socially conscious fiction writer of the seventies, Shyamal Gangopadhyay, has given space to the reality of the helplessness that second World War brought to people's lives. Important issues such as the crisis of the post-war period, doubts, the hard struggle caused by partition, economic hardship, the crisis of values of the middle class, etc. have emerged in his literature. Shyamal Gangopadhyay has seen people, understood the world and he discovered himself in various ways. Just as he wanted life and the world, people and nature appeared to him with diverse resources which he developed his own perspective. The pain, regret, mental inclinations, and complications of modern life were not avoided in his stories. This article has tried to discuss the way in which life narratives or life thoughts have emerged in his works by adopting the events of a few selected stories. The characters in the story seem to be alive in the author's own characteristics. The life story has been revealed through this. Some selected stories are like 'Sakshi Dumur Gacha', ‘Urbarashakti', 'Dakhal', 'Pari', 'Nishithe Sukumar', 'Adbhut Baganer Chashi' etc. In the story 'Sakshi Dumur Gacha', we see how inhumane the behavior of sons towards helpless parents is in modern society. Shyamal Gangopadhyay talks about the terrible inhumanity and degradation in the story 'Sakshi Dumur Gacha'. In the story 'Urbarashakti', the story of a middle-class helpless man is told among the characters of welfare. Along with this, the reproduction of cats from the fox or tiger group and the birth of the grandson of one of the narrators from the monkey group bind animals and humans in a thread. In the story 'Dakhal', he has left the huge population of city life and chosen that part of the town where the wind of modernity has just blown. Shyamal Gangopadhyay has highlighted this changing human and non-human world in the story 'Dakhal'. The context of the story 'Pari’ is the belief tendency of people. The belief that things match. The belief that Bipin Biswas brings down fairies. And the story revolves around the belief in bringing down fairies. The story is presented in the description of some small incidents. In this way, Shyamal Gangopadhyay has highlighted the life story in his various stories and has highlighted the existence, humiliation, and crisis of man in the weaving of the story, and this will be an attempt to reveal this in the article under discussion.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

"মন রে কৃষি কাজ জানো না
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা" – (রামপ্রসাদ সেন)

সামাজিক দোলাচলতা, আর্থিক অ-স্বচ্ছলতা, রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসা, তার মাঝে মানবরূপ 'জমিন' এ সোনা ফলানো। প্রায় সম্ভব না হলেও অনেকটাই সম্ভব। যদি ব্যবহারের কৌশল বা বিদ্যাটা জানা থাকে সঠিক। না হলে চাণক্য হয়তো বলবেন - 'অবিদ্যাজীবনং শূন্যং দিকশূন্যান চেদবান্ধবা'।[১] কিন্তু যে ব্যক্তি শিক্ষিত, যার বন্ধুর কোনো পরিসংখ্যান নেই, তার কি কোনো শূন্যতা বা অভাব থাকে না! আশা করি থাকে। কারণ মানুষের শূন্যতা তৈরি হয় তখনই, যখন মানুষ কী চায়, আর কী না চায়, সে সম্পর্কে থাকে অজ্ঞানতা। আসলে চাওয়া, না-চাওয়া এবং পাওয়া, না-পাওয়ার ভিড়ের কতটুকু ফাঁক দিয়ে নিজের কর্তব্যের পা ঠিক ঠিক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে জীবনের সামঞ্জস্যতা বজায় থাকবে, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না মানুষ। আর বুঝে উঠতে পারেনা বলেই এক শরীর বহু মন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। গ্রহণ করে ভিত্তিহীন সিদ্ধান্ত। মানুষ নিঃসঙ্গ, নিরুপায়। সমাজ পরিবারের বোঝা ঠেলতে ঠেলতে জীবন টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এই টুকরো হয়ে যাওয়া এক একটা জীবনের গল্প নিয়ে হাজির হয়েছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজস্ব জীবন বিচিত্র। ১৯৩৩ সালের ২৫শে মার্চ বর্তমান বাংলাদেশের খুলনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কৈশোর থেকে জীবনের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বেশিটাই কেটেছে কলকাতায়। কলকাতায় এসে পড়াশোনা, পরে ছাত্র রাজনীতিতে যোগদান। রাজনীতি করার অপরাধে কলেজ থেকে বিতাড়িত হলে বেলুড়ে একটি ইস্পাত কারখানায় গা পুড়িয়ে আড়াই বছর চাকরি করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। পরবর্তীতে চাকরি ছেড়ে আশুতোষ কলেজ থেকে বাংলা অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হন। পরে সংবাদ প্রতিষ্ঠানে লেখালেখির পাহাড় গড়েছেন। প্রথমে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যোগ দেন ১৯৫৮ সালে। এই পত্রিকার 'ভূমিলক্ষ্মী'-র পাতায় 'বলরাম' ছদ্মনামে লিখতেন। পরে ১৯৭৭-এ আসেন 'যুগান্তর' পত্রিকায়। তারপর ১৯৯০ থেকে আমৃত্যু 'আজকাল'-এ। চম্পাহাটিতে বসবাসকালে কিছুদিনের জন্য ডেলিপ্যাসেঞ্জারের জীবন, তা না হলে জীবন ও জীবিকার সূত্রে কলকাতাতেই বাস। আবার কখনও তিনি মহানগরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে সুন্দরবনে জনপদের মধ্যে বসবাস করতে চলে গেছেন। নিজের হাতে চাষবাস করে, জোতদার চাষি হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি হয়ে গেছেন অক্ষরজীবী মানুষ। পত্রিকা সম্পাদনা, সাংবাদিকতা সব কিছুই তিনি করেছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে দেখেছেন। জগতকে বুঝেছেন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যত খনন করেছেন তত তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেছেন নানা ভাবে। তিনি যেমন ভাবে এই জীবন ও জগতকে চেয়েছিলেন, তেমন ভাবেই মানুষ ও প্রকৃতি বৈচিত্র্যময় সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিল তাঁর কাছে। যা নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। নিছক কলমজীবী না হয়ে থেকে তিনি জীবনকে ঘেঁটেছেন, বারবার ভেঙ্গেচুরে নতুন করে তৈরি করেছেন। যা করতে গিয়ে আধুনিক জীবন যন্ত্রণা, আক্ষেপ, আফসোস, মনের প্রবৃত্তি, জীবনের জটিলতা কিছুই এড়িয়ে যায়নি তাঁর গল্প-উপন্যাসে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেছেন -

"শ্যামলের গল্পে জীবনের গভীর গভীর রহস্যের কথা আছে, যাকে দর্শন বলা যায়।"[২]

নিবাচিত কয়েকটি গল্পের চরিত্র ও ঘটনা প্রসঙ্গ অবলম্বন করে, তাঁর রচনার মধ্যে জীবন আলেখ্য বা জীবন ভাবনার ছবি উঠে এসেছে তাই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধে। গল্পের চরিত্রগুলি যেন লেখকেরই বিভিন্ন সত্তার বিভিন্ন রঙে হয়ে উঠেছে সজীব ও সরস। যা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে লেখকের গল্পের জীবন আলেখ্য।

'সাক্ষী ডুমুর গাছ' শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম একটি গল্প। বৃদ্ধ অসহায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের আচরণ যে কতটা অমানবিক, আধুনিক সমাজে তা আমরা দেখতে পাই। এমনকি সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেও তাঁদের বৃদ্ধাশ্রমে বা অজানা পথে ছেড়ে দেওয়ার মতো ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক ঘটনাও আমাদের অজানা নয়। যা সংবাদপত্র কিংবা খবরে প্রায়শই শোনা যায়। এই ভয়ঙ্কর অমানবিক ও সমাজের অবক্ষয়ের কথাই বলেছেন গল্পকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তাঁর 'সাক্ষী ডুমুর গাছ' গল্পে। 'সাক্ষী ডুমুর গাছ' এমনি একটি গল্প যেখানে উপস্থাপিত হয়েছে ব্যক্তি

মানুষের অসহায়তাবোধ, সমাজের অবক্ষয় এবং চরম জীবন সত্য। এক অসহায় বৃদ্ধের দুর্ভাগ্যের সাক্ষী হল 'সাক্ষী ডুমুর গাছ'। গল্প কথকের মেসোমশাই একজন কমিশারিয়েটের ক্লার্ক। মেসোমশাইয়ের সংসারের প্রতি দায় দায়িত্ব যাবতীয় আচরণ কথকের মনকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কথকের মফঃস্বল জীবনের ভালোমন্দ মিশে থাকলেও মেসোকে তিনি কখনও ভোলেননি। মাসির মৃত্যুর পর মেসোকে জীবন নির্বাহের জন্য নির্ভরশীল হতে হয় তার ছেলে মেয়েদের উপর। মেয়ে লতিকা তার শ্বশুর বাড়িতে বাবাকে নিয়ে গেলেও, তার অর্থ লোভের দিকটি গল্পে স্পষ্ট হয়েছে। মেসোর অসহায় অবস্থার সাক্ষী ছিল ডুমুর গাছটি সঙ্গে গল্প কথক। মানুষের দীর্ঘতম শৈশব জীবন বাবা মায়ের প্রতি অধিক নির্ভরশীল হলে, মানুষের মনে জন্ম নেয় প্রতিশোধ স্পৃহা, পুত্র কন্যার তার সঙ্গে এরূপ অমানবিক আচরণে বৃদ্ধ মেসো তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ডুমুর গাছটির দিকে তাকিয়ে মেসো কথককে জীবন সম্পর্কে এক ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন -

> "অনেক দিন ধরেই জানি- আমরা কারও নই। তোর মাসি যে চলে গেছে দু'বছর – আর কি কোনো বন্ধন আছে আমাদের সঙ্গে তার? কিচ্ছু নেই। মায়ার বশে আমরা হাসি- কাঁদি।"[৩]

অর্থাৎ তাঁর জীবনেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এই পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। রবীন্দ্রনাথের সেই চেনা জীবন সত্য, সেই চিরবাণীই বয়ে চলেছে- 'পৃথিবীতে কে কাহার!' – তাই তো রতনকে ছেড়ে পোস্টমাস্টারের চলে যাওয়া। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। জীবন তৃষ্ণা শুধু মেসো কেন, সকল মানুষকে বাঁচতে শেখায়। সে জন্যই হয়তো খাদের পাশে চাঁদ এবং গঙ্গার ধারে চিতা কাঠ ডাকলেও শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন - 'যাবো কিন্তু, এখনি যাবো না'। কিন্তু শেষমেশ ছেলে মেয়ের কাছে বৃদ্ধ পিতা-মাতার মৃত্যুই কাম্য। যেটুকু আদরযত্ন, দেখভাল বা সৌজন্যবোধ পিতা মাতার প্রতি, শুধুমাত্র সম্পত্তির লোভেই। আলোচ্য গল্পে বৃদ্ধ হলেন গল্প কথকের মেসো, যার অসহায়তাকে কাজে লাগাই তার সন্তানরা শুধুমাত্র সম্পত্তির লোভে। এই অসহায়তা শুধু মেসোর একার নয় এ অসহায়তা সমগ্র বৃদ্ধ পিতার। মেসো তো শুধু প্রতীক মাত্র। বৃদ্ধ মেসোকে তার মেয়ে সমস্ত সম্পত্তি নিজের করে এক গন্তব্যহীন অচেনা দেশের উদ্দেশে ট্রেনে তুলে দেয়। অর্থাৎ মেসোকে যেন ঠেলে দেয় জীবনের অন্ধকারময় জগতে। যে জগৎ থেকে মেসোর ফেরার কোনও রাস্তা নেই। 'সোনালি দুঃখ'-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন -

> "একজন স্বাধীন মানুষের দু'রকম সম্পত্তি থাকে, নিজের শরীর আর তার জমি।"[৪]

আলোচ্য গল্পে অসহায় বৃদ্ধের 'শরীর' এবং 'জমি' এই দুই সম্পতি তার সন্তানরা এককথায় কেড়েই নিয়েছে। অর্থাৎ শেষ বয়সে পিতার জীবনের যে পরিণতি হয় বা হতে পারে মেসোর জীবন দৃষ্টি বা জীবন ভাবনার মাধ্যমে গল্প কথক তুলে ধরেছেন। সঙ্গে ছেলে মেয়েদের মোহকেও। আলোচ্য গল্পে সমকালীন দৃষ্টিকোণে যে সমাজের অবক্ষয়কে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তুলে ধরতে চেয়েছেন যা শুধুমাত্র সমকালীন সময়েই নয়, আজ একুশ শতকের ত্রিশ দশকেও সমান প্রাসঙ্গিক।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উর্বরাশক্তি' অপর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। যেখানে তিনি নিরুপায় মানুষের কথা বলেছেন, যার মধ্যে কল্যাণ হল একজন। কল্যাণের মাধ্যমে গল্পের সূচনা হলেও, এটি মূলত একটি বিড়াল জুটির সম্পর্ক যাপনের গল্প। কল্যাণ সেখানে দর্শকমাত্র এবং আমরা কল্যাণের সহদর্শক। একটি বিড়াল নারী, অন্যটি হুলো পুরুষ বিড়াল। বিড়ালটি কল্যাণের বাড়ির আবাসিক বাসিন্দা হলেও, হুলোটি বহিরাগত। কল্যাণের বারান্দার বাগানেই তাদের আলাপ পরিচয়। বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় দুজনের দেখা হয় কোনো এক জ্যোৎস্না রাতে। হুলো বহিরাগত হলেও আচরণে সে উদ্ধত এবং স্বাধীনচেতা। তার হাবভাব এমন 'পৃথিবীটা যেন ওদের দুজনের। মানুষজন সব আসলে বেড়াল'। কল্যাণের দৃষ্টিতে 'আহার, বিহার আর মৈথুনে পারদর্শী একজন উচ্চশ্রেণীর বিষয়ী'। সে হুলোটির নাম দেয় 'প্রিয়গোপাল বিষয়ী' আর বিড়ালটির নাম রাখে 'রাধারানী'। ওদের প্রথম দুটো বাচ্চা হয়, একটি পুরুষ ছানা, অন্যটি মেয়ে ছানা। দুটো বাচ্চাই দুর্ঘটর্ঘনায় মারা যায় দুজনের দুটো কার্যকারণে। একটা পুরুষ বাচ্চাকে হুলো খেয়ে ফেলেছিল। অন্যটি অর্থাৎ মেয়ে বাচ্চাটি মায়ের দাঁতের চাপে মারা যায় এঘর ওঘর করতে গিয়ে। কিন্তু হুলোর পুরুষ বাচ্চাকে খেয়ে ফেলার পেছনে কারণটি ছিল অন্য। হুলো জানত যুগের রীতি অনুযায়ী পুরুষ ছানা বড় হয়েই মায়ের সঙ্গে শুয়ে পরতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে গল্প কথক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আসামের চা বাগানের ম্যানেজার সি জি অ্যালেন-এর সঙ্গে কল্যাণের কিছু কথাবার্তা সংলাপ বদ্ধ করেন। তার কিছু অংশ তুলে ধরছি-

> “অ্যালেন আচমকাই মাঠের একপাল গরু দেখিয়ে বলল, আমি ওদের রেইজ করেছি। সব আর্টিফিসিয়ালি। গাভিন হবার পর ওদের আলাদা করে দিই। বাচ্চা হলেও আলাদা করি। পাহারায় রাখি।
> -কেন?
> -ছেলেই হয়তো বড় হয়ে মা-তে উপগত হলো। সেটা কি ভালো?
> -ওদের নরমস তো আলাদা।
> -আমি ওদের সিভিলাইজড করছি।
> পরে কল্যাণ এই সমস্যায় প্রিয়গোপালের বিবেচক ও তড়িৎ ভূমিকার একটা মানে খুঁজে পেয়েছে।”[৫]

অর্থাৎ গল্পকার এখানে কোথাও যেন ইদিপাস কমপ্লেক্স-কে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যা সম্পর্কে হুলো এবং ম্যানেজার অ্যালেন দুজনই সচেতন, দুজনই বিজ্ঞ। ক্রমে কিছুদিন পর রাধারানীর পেট মোটা হয় আবারো। পনেরোই জুন রাধারাণীর আবার একটি খোকাও খুকি হয়।

> “সে কাউকে ছানা দেখাতে চায় না। তাই আলনার শেষ র‍্যাক থেকে বুকর‍্যাকে যায়। বুকর‍্যাক থেকে জুতোর বাক্সে!”[৬]

বাচ্চাদের জন্য সে খোঁজে নিরাপদ আশ্রয়। ক'দিন পর বাচ্চারা একটু বড় হয়ে উঠলে দুটোতে মিলে খেলাধুলো করে। রাধারানী মাছের কাটা মুখে নিয়ে বাচ্চাদের ডাকাডাকি করে। মায়ের ডাক এমনি মমতাময়ী। কিন্তু পুরুষ চরিত্র! প্রিয়গোপাল মশাই বাচ্চা হবার পর থেকে রাধারাণীকে কাছে পাচ্ছে না। সে কল্যাণের বারান্দার লাগোয়া পাঁচিলে এসে রাধাকে ডাক দেয় ‘এই রাধা। আয়। যাবিনে?’ রাধারানী কোন জবাবই দেয় না। বাইরের লোকে হুলোর যে ডাক শোনে, সে ডাক আদেশের। যখন সে ডাক একটু খাদে নামে সেটা হলো আশাভঙ্গের। সে আবারো ডাকে আয় হৈমি ডাক্তারের বাড়ির ছাদে যাই। ও-বাড়ি আজ চতুর্থী। মৎস্যমুখী হচ্ছে। আয় বলছ- কাজ হলো না তাতেও। তারপর মাঝরাতে প্রিয়গোপাল একদম ঘরের ভেতর এলো। জানালা গলে। হিসেব নেওয়ার ভঙ্গীতে। ... প্রিয়গোপাল বাঘের ভঙ্গিতে মেঝেতেই বসলো। দু হাত দুরে রাধারানী একই ভঙ্গিতে বসা। মাঝখান খোকাখুকু খেলছে। রাধারানী মিনতি করে দীর্ঘ ম্যাঁও ধ্বনি দিয়ে অনুরোধ করছে এবার যেন বাচ্চাদের না খায়। অন্ধকারেও কল্যাণ দেখতে পায় চারজনের আট জোড়া চোখ। বাপ এবং খাদক হিসেবে প্রিয়গোপালের সহনশীলতা কল্যাণকে মুগ্ধ করে। কেননা প্রিয়গোপাল এদেশের ভোটার নয়। নাগরিক নয়। যদিও সে এখানকার জল হাওয়ায় বড় হয়েছে। আচার আচরণের জন্য সে দেশের আইনের কাছে দায়বদ্ধ নয়। সে চাইলে সবার সামনে রাধারানীর উপর উপগত হতে পারতো। এই বর্ণনাটুকু পড়তে পড়তে মানুষ হিসেব মানব সমাজের সাথে তুলনাটা আপনাতেই চলে আসে। লেখকও চেয়েছেন সেটাই। বাড়িতে একটি অতিথি আছে। কল্যাণের মেয়ে এসেছে। তারও বাচ্চা হবে। কল্যাণের স্ত্রী মেয়ের সেবা নিয়ে ব্যস্ত। বাচ্চা হবার আগে বেড়ালছানা দুটো পার করতে হবে। নইলে মানুষের বাচ্চার অনিষ্ট হবে। কল্যাণ তার নিজের জীবনকে নিয়ে ভাবে। কোথাও কোথাও সে হুলোটার চেয়েও অসহায় পরাধীন। হুলোটি যতটা স্বাধীনভাবে রাধারানীর কাছে যেতে পারে, সে পারে না তার রাধারাণী বিজয়ার কাছে প্রত্যাখ্যানের দাপটে। তবু তার একটি মনোবেদনা প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনার ছাপ রেখে যায় গল্পের শেষাংশে পৌঁছে। অনন্য শংকর দেবভূতি তাঁর ‘শ্যামলের গল্পের বিষয় আশয়’ প্রবন্ধে বলছেন-

> “উর্বরাশক্তি’ গল্পে কল্যাণ নামক এক মধ্যবিত্তের জীবনের পরিচিতি অসাধারণ মুন্সীয়ানায় দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে বয়সে ঘুম কম আসে, রিটায়ারের বাকী থাকে তের বছর- স্ত্রী আলাদা শোয়, পেচ্ছাপ কম হয়, এমন একটা মানুষ, যে বেঁচে থাকে একই সমাজে নিরুপায় ও কিছু মনুষ্যেতর প্রাণির

> সঙ্গে। একটা মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া পাওয়া না-পাওয়ার হিসেব নিকেশগুলো এত সহজ গদ্যে হয়তো অন্য কোন গল্পে লক্ষ করা যায় না।"[৭]

মানব সমাজ এবং বিড়াল সমাজের নিজস্ব যে জীবনবোধ বা জীবন আলেখ্য থাকে এবং তা থাকা দরকার, সেটা একটা তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আচরণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সরস এবং সহজ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

পরবর্তী আলোচনার গল্প 'দখল', অন্যতম গল্পগুলির মধ্যে একটি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নগরজীবনের বিপুল জনবসতি ছেড়ে, জনপদের সেই অংশকে বেছে নিয়েছেন, যেখানে সবে মাত্র লেগেছে আধুনিকতার হাওয়া। এসেছে বিস্বাদময় জীবনে একটু স্বাদ। একদিকে চিরাচরিত স্থির গ্রাম, অন্যদিকে নিঃশব্দে কলকাতার এগিয়ে আসা। ফলে বদলে যাচ্ছে জনপদের চেহারা ও তার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ। আর এই বদলে যাওয়া মানুষ ও মানুষেতর পৃথিবীর কথা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় শুনিয়েছেন 'দখল' গল্পের শুরুতে। যেখানে আমরা দেখতে পাই - রেলস্টেশন, রেল লাইন ন্যাশালাইজেশন, ব্যাংক। প্রধানত সুন্দরবনকে আমরা যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু তেমনভাবে অভ্যাস করান নি। তিনি পুরাতনকে নতুনভাবে দেখিয়েছেন, নতুন করে চিনিয়েছেন। গল্পের কাহিনি বর্ণনা হয়েছে মূলত বাদা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। যেখানে পরিশ্রমই একমাত্র মূল মন্ত্র। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রম শেষ সন্ধ্যেয় নিয়ে আসে অবসাদ ও ক্লান্তি। যা ঘিরে তৈরি হয় অবসর। সেই অবসর ওদের জীবনে নিয়ে আসে 'এন্টারটেনমেন্ট'। আধুনিক নগর সভ্যতার ছোঁয়ায় তাদের আদব কায়দা, রীতিনীতি, আচারবিচার- সব কিছুর পরিবর্তন হতে দেখা যায়। যেমন 'লিভ টুগেদার', কথাটা বিদেশি হলেও, আমরা কমবেশি সকলেই এর সঙ্গে পরিচিত। 'দখল' গল্পের দাক্ষী আর ভবেন। এদের সম্পর্কটা আসলে কী? তা স্পষ্ট নয়। বাকদত্তা বা স্বামী-স্ত্রীও না। কিন্তু থাকে এক সঙ্গে। তাই হয়তো আধা ডাকাত, আধা চোর, সদ্য জেল ফেরত সন্তোষ টাকির অবাধ প্রবেশ দাক্ষীর জীবনে। যে আদিমতা পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে মিশে আছে। যে আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক'। আদিম সংঘাত, সংঘর্ষ, রক্তপাত। এক নারী দুই পুরুষ সভ্যসমাজের বিশ্বাসের বাইরে। সেজন্যই –

> "স্টেশনমাস্টারের বউ পোস্টমাস্টারের বউকে বলল, চলুন না দিদি- দুজন পুরুষ একজন মেয়েছেলের দখল নিচ্ছে কি করে, দেখে আসি একবারটি।"[৮]

দুই পুরুষ এক নারীর অধিকার, সাপের শঙ্খ লাগার প্রতীক। গল্পের দুই পুরুষ ভবেন ও সন্তোষ টাকি'র লড়াই আসলে সাপের শঙ্খ লাগার সংকেতকে বহন করে। লড়াইয়ে যে জিতবে তার অধিকার হবে স্ত্রী সাপের সঙ্গ লাভের। সেকারণে ভবেন ও সন্তোষ টাকির লড়াইয়ের দৃশ্য আমরা গল্পে দেখতে পাই। কারণ লেখকের জীবন ভাবনায় এটাই স্বভাব, এটাই আদিম। আর গল্পের যে সাপ, তার অর্থ সৃষ্টি। 'অজস্র বীজ থেকে যেমন ফসলের প্রাচুর্য, তেমনই অসংখ্য সাপের ছানা যেন এক উদ্যম সৃষ্টির সম্ভাবনা।' সেজন্যই বুড়োবুড়ি দুই সাপের কাছ থেকে সাপের বাচ্চা, নাতি নাতিন সকলকে বাঁচাতে আশু'র আগমন। লেখক যেন হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর ফিরে আসার সংকেত দিচ্ছেন। সংকেত দিচ্ছেন আদিম সমাজে ফেরার। না হলে সন্তোষ টাকি বারবার কেন বলবে 'তুই কে দাক্ষী, তুই আসলে কে?' দাক্ষী হল পৃথিবীর সেই আদি অংশ, সভ্যতার আলোর অংশটুকুও যেখানে পৌঁছায়নি। অন্যভাবে বললে পৃথিবীর সেই আলোকিত জগৎ যাকে আধুনিক সভ্যতা ছুঁতে পারেনি। আসলে লেখক বইয়ের মার্জিনের বাইরে দাঁড়িয়ে শনাক্ত করেন মানুষের আদিমতা লোভ, কাম, দখল, সংস্কার। যা ঘিরে তৈরি হয়েছে গল্পের জীবন ভাবনা।

পরবর্তী গল্প 'পরী'। 'পরী' গল্পের প্রেক্ষাপট মানুষের বিশ্বাস প্রবণতা। যে বিশ্বাস বস্তু মেলায়। যে বিশ্বাস বিপিন বিশ্বাসের পরী নামায়। আর পরী নামানোর বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই গল্পের আবর্তন। কিছু ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনায় পরিবেশিত হয়েছে গল্পটি। লেখক এবং লেখকের পরিবার। লেখকের চাকরি জীবন। প্রতিবেশ-পরিবেশ। এইরকম কিছু চিন্তাশীল ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে গল্পে বিপিনের পরী নামানোর ঘটনাটি। গল্পের বিপিন বিশ্বাস একজন বেহালা বাদক। যা থেকে নিজের জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু পরী নামানোর ঘটনাটি তিনি নিজেও বিশ্বাস করেন এবং চেষ্টাও করেন অন্যদের বিশ্বাস করানোর। গল্পে তিনটি শরীরী চরিত্র, একটি অশরীরী। বেহালাবাদক বিপিনবাবু, লেখক বা কথক

এবং লেখকের স্ত্রী মিলে তৈরি হয়েছে গল্পের 'একটিভ' চরিত্র। এবং পরী এক কল্পিত নারী চরিত্র। যে বিপিনের দৃষ্টিতে এক, লেখকের দৃষ্টিতে অন্য এক। যে বিপিন 'মাঘী পূর্ণিমায় সারারাত দিঘির পাড়ে বসে বাজাতে পারলে পরী নামানো যায়' - তে বিশ্বাসী। যা হয়তো কখনই সম্ভব না। কিন্তু অবাস্তবকে বাস্তব ভাবার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে বিপিন চরিত্রটির। যিনি প্র্যাক্টিকল কিন্তু অলৌকিক। তিনি বেহালাবাদক, কিন্তু যা পাওয়ার বিরুদ্ধ তাকেই পেতে চান। লেখক ঠিক বিপিনের বিপরীত। তিনি সৌখিন, কিন্তু স্বচ্ছল নন। তাঁর স্ত্রী তাই তো গঞ্জনা করেন –

> "কোনও কাণ্ড জ্ঞান যদি থাকে। ক'পালি চাল আছে ঘরে শুনি? রোজ রোজ লোক ধরে আনা চাই-।"[৯]

অন্যদিকে তিনি সচেতন, কিন্তু লোভী নন। তিনি বোঝেন ঠিক ভুলের পার্থক্য। কিন্তু ধরিয়ে দেন না, ঠিক কোনটা আর ভুল কোনটা। কারণ গল্পের শেষে বিপিন যে পরীকে দেখে, সে আসলেই কোনো পরী না, তা জানা সত্বেও বিপিনের ভুল তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেন। আসলে পরী আসে বিপিনের কল্পনায়, আরামদায়ক চিন্তা হিসেবে। 'আমার শ্যামল' গ্রন্থে ইতি গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন-

> "বেহালা বাজিয়ে জোছনা রাতে যিনি পুকুর থেকে পরির উঠে আসা আমাদের দেখিয়েছিলেন। আসলে বিপিনবাবু আমাদের দেখাতে পারেননি কিছুই। দেখেছিলেন উনি নিজেই, পরিকে কল্পনায়। কিন্তু তাঁর কল্পনার এত জোর ছিল যে শ্যামল নিজেই ওই 'পরী' গল্পে সেই রাতটিকে ফুটিয়ে তুলতে বাধ্য হল।"[১০]

উদাসীন পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরী একটি উপশম। বিশেষত চেতনাগত সংঘাত, বিশ্বাসের সংঘাত বা লেখকের মানবিক দ্বন্দ্ব গল্পের বিষয়বস্তুকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। কারণ আমাদের সব কিছুতে বিদেশি স্পর্শ না থাকলে বুঝি বিশ্বাসের চৌকাঠ পার হতে পারে না। 'পরী' গল্পে বিপিন বিশ্বাস বেহালা বাজিয়ে পরী নামানোর কথা বললে, এটা শহুরে মানুষের কাছে হাস্যকর মনে হতেই পারে, কিন্তু বিপিনের কাছে এটা গভীর বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের ভিত বড়ো শক্ত। যে বিশ্বাসে কথকের প্রায় তরুণী বধু জড়িপাড় কালো শাড়ি পরে বাগানে জ্যোৎস্না রাতে নীলাম্বরী পরী হয়ে এসে দাঁড়াতেই বিপিনবাবুর বেহালার ছড়ের টানে বেহাল পরী ধুলোর বাস্তবতায় নেমে আসে। বিশ্বাসযোগ্য সেই আবির্ভাব, এমন কি তা সম্ভবপর বলেও প্রতীয়মান হয়।

'নিশীথে সুকুমার' গল্পে চাকুরীজীবী উদাসীন পুরুষের ছবি উঠে এসেছে। সুকুমার একজন মধ্যবৃত্ত চাকুরে। সারাদিনের ব্যস্ততা কাটিয়ে মানসিক চাপমুক্তির জন্য প্রতিদিনের মতোই নেশা করে বাড়ি ফেরা সুকুমারের অভ্যাস। কিন্তু নিত্য দৈনন্দিন এই অভ্যাসে তার পরিবার অশান্ত ক্লান্তও। সাংসারিক দায়িত্ব পালন করতে করতে জীবনের হাসি গম্ভীরতা অনেকসময় খুনি ও গরুর মতো নির্বোধতায় পরিণত হয়। সেকারণে তেতাল্লিশ বছরের সুকুমার সংসারে যেন এক পুতুলে পরিণত হয়েছে। তাই হয়তো আলমারির আয়নাটার সামনে উলঙ্গ হয়ে নাচ শুরু করে দেয়। নাচতে সুকুমারের ভালো লাগে। কারণ নাচ আমাদের ধর্ম এখন। এই নাচ সুকুমারের মতো আমরাও কি নিত্যদিন নেচে চলছি না? এই প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ –

> "ব্যক্তিমানুষের মনের শূন্যতাবোধ এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করার দুর্নিবার বাসনা থেকেই পাশ্চাত্যে অস্তিত্ববাদ নামের দার্শনিক তত্ত্বটি জন্ম নিয়েছিল উনিশ শতকের বিশ্বযুদ্ধের মধ্য ভাগে। অস্তিত্ববাদ 'বেঁচে থাকা' অর্থাৎ অর্থহীন ভাবে জীবন যাপনের কথা বলে না, বলে 'অস্তিত্বশীল' হওয়ার কথা।"[১১]

ন'হাজার টাকা বেতন, রবীন্দ্র সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব, পূর্বভারত, ব্রজেনশীল নিয়ে আলোচনা- শিক্ষিত মধ্যবৃত্ত পরিবারের বিচিত্র নিয়ম। দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবন সংসার সন্তান জন্ম – এটা যেন একটা সিস্টেমের মধ্যে এসে পড়েছে। স্বামী স্ত্রীর শাসনে ঢোকার চেষ্টা করছে অবমাননা- গালিগালাচ। 'বেলার মুখে এসেছিল শুয়োর। কিন্তু স্বামীকে কোনোদিন এসব কথা বলেনি বলে আস্তে বলল, বিচ্ছিরি।' মেয়ের কাছ থেকে আসে মুখ গঞ্জনা। এই সমস্ত সহ্য করে নেওয়া সুকুমারের মতো সমস্ত পুরুষ জাতির ধর্ম হয়ে উঠেছে। সুকুমারের উলঙ্গ হয়ে নাচার মতো অস্বাভাবিক কাজকর্মে স্ত্রী হয়ে ওঠে প্রাচীনমূর্তি। যে

প্রাচীনমূর্তি – বাজার করে। সংসার করে। ছেলে মেয়ে পড়ায়। রেশন আনে। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল তার ধর্ম। একে অপরের সংস্পর্শে জেগে ওঠে সে বোধ। 'সে সুকুমারের ধর্ম নিতে পারে' কিন্তু বাইরের আলো এসে পড়তেই সে সরে যায়। অর্থাৎ স্বামীর নগ্ন নাচ তার সহধর্মিণীকে স্পর্শ করে কিন্তু জাগাতে পারে না। সুকুমার চাই তার এই ধর্ম সবাইকে দিতে, সে কারণে বন্ধু গণেশ ডাক্তারের বউকেও তার ধর্ম নিতে বলবে। অর্থাৎ -

> "অস্তিত্বের এই চূড়ান্ত অর্থহীনতার মধ্যেও শ্যামলের চরিত্রেরা কিন্তু থেমে যায় না। অনির্দিষ্ট গন্তব্যে হলেও তারা এগিয়ে যায় নিজেদের মতো করে। তারা হয়ে ওঠে মানব অস্তিত্বের চলমান ইতিহাসের দিশারী। (কাম্যুর সিসিফাসের কথা মনে পড়তে পারে এই প্রসঙ্গে)। অস্তিত্বের অর্থ তার চিরন্তন এই যাত্রা, কোনও নির্যাসরূপ লক্ষ্যবস্তু নয়।"[১২]

'অদ্ভুত বাগানের চাষি' শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম একটি গল্প। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি যা থাকে সুপ্তও। গল্পে তারই বহিঃপ্রকাশ অন্যভাবে। বড়োলোকের প্রবৃত্তিতে কাজের মেয়ের শরীর সমর্পণ। গল্পে সরলা, সিঙঘানি বাড়িতে কাজের মেয়ে হয়ে ঢোকে। সরলার জীবন সরল, হিসেবও সরল। স্বামী নাইট ডিউটি করে। ভীষণ বিড়ি টানে। সে গন্ধ সরলার গায়ে লেগে থাকে। অপর দিকে প্রায় বৃদ্ধ ভরতনারায়ণ যার কাপড়ের কারখানা আছে, উড়োজাহাজ আছে দুটো, আছে মাইনে করা চাকর। সরলা কাজ করে সে বাড়িতে। তার জন্য বাড়ির নিয়মিত পোশাক, যা তাকে এই বাড়ি থেকেই দেওয়া হয়। তাকে বেতন দেওয়া হয় কেটে রেখে তিন হাজার সাতশো। অর্থাৎ চাকর হলেও তাদের পোশাক এবং বেতন সিস্টেম অনেকটাই সরকারি চাকুরি জীবীদের মতো। উদাসীনতাও গল্পে লক্ষ করা যায়। তাই কাপড় কল পুড়ে গেলেও কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। বয়সের অবসরে দায়িত্ব থেকেও অবসরপ্রায়। বড়লোক প্রতিপত্তিশীল পরিবারের যে একটা চালচিত্র তারই প্রতিচ্ছবি গল্পে। সরলা বলে-

> "কত বড়লোক রে বাবা উড়োজাহাজ আছে তাও দুখানা। কারখানা তো আছেই। এবাড়িতে মোটরগাড়িগুলো সব দেদার খেলনার মতো। এত যে টাকা পয়সা কোনও হইহুল্লর নেই। মদ বিড়ি নেই।"[১৩]

কিন্তু সরলার স্বামী দোলের দিন দুপুর করে বাংলা খায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে। আসলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দুই দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে দুই পরিবারের জীবন ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। একদিকে সরলা ভরত নারায়ণের ভালো দিক এবং তার বড়লোকিয়ানাকে ভালো মানসালোকে ব্যক্ত করেছে। অপরদিকে ভরত নারায়ণ সরলার সহমতে, তার সরল মন ও শরীরের পিপাসী হয়েছে। সরলার সম্পর্কে ভরত নারায়ণের মুখে বেরিয়ে আসে-

> "বেসাহারা। ফুটে কৌড়ি। আনপঢ়। গাওয়ার। বদসকল।"[১৪]

কিন্তু তাতেও তার সরলাকে ভালো লাগে, সরলার শরীরকে ভালো লাগে। কারণ 'কতদিন অল্পবয়সী টনটনে মেয়ে' দেখেনি ভরত নারায়ণ। মানুষ প্রতিপত্তিতে যত বড়ই হোকনা কেনো, শারীরিক চাহিদা যে সর্বত্র লাভ করতে পারবে তা নয়। অনেক সময় সম্মানহানীর ভয়ে সে অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হতে থাকে। তাই সেসব ছাড়িয়ে সরলার উদ্দেশে ভরত নারায়ণকে বলতে শুনি-

> "আমরা বিয়ে করি চল- আবার নতুন করে জীবন হবে।"[১৫]

প্রয়োজনে সে সরলার স্বামীকেও সঙ্গে নিতে চাই। কারণ জীবনের শেষে ভরত নারায়ণের মনে হয়েছে 'পহলে ম্যায় এক ইনসান হুঁ।'

'চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়' গল্পে দেখবো অসাধারণ অথচ আজব চরিত্র অমৃত দাশ পেশায় রিকশা চালক। নারকেলবেড়ে তার বাড়ি। কাজের মধ্যে থাকে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার যে সে নির্জন জায়গায় ভগবানের খোঁজ করে এবং সে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 225
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাকি দেখাও পায়। স্বাভাবিক ভাবে এটা সম্ভব নয় জেনেও কথক শ্যামল গাঙ্গুলি অমৃতের সঙ্গে ভগবান দেখতে বেড়িয়ে যান। সেখানে –

> "অমৃত দিব্যি দু'খানা মাচানের পাশ কাটিয়ে একটা ঢিবি মতন জায়গায় উঠে ডাকল আমায়, চলে আসুন- এখান থেকে ভগবানকে দেখার খুব সুবিধে-।"[১৬]

কিন্তু ব্যবসায়ী শ্যামলবাবুর চোখে ভগবান ধরা দেয় না।

> "অমৃত দেখল ভগবানের এখানে কোনো শেষ নেই। যতই এগোয় ততই বেড়ে যায়। মনটা কিসে ভরে যাচ্ছে... বাতাসে কিসের সুবাস। ...হলুদ ফুল। গুড়ো গুড়ো পরাগমাখানো কেশরগুলি... ভোরের বাতাসে দুলছে... কুঁচো পাখির চেয়েও ছোট দেখাচ্ছে শ্যামলবাবুকে।"[১৭]

অর্থাৎ এখানে ভগবান হল ভেতরের সৌন্দর্যরূপ, ভেতরের অসীমতা। ছোট আমি'র বড়ো আমি'তে উত্তরণ। ছোট আমি এবং বড়ো আমির দ্বন্দ্বে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এভাবেই বড়ো আমিকে তুলে আনেন। মাচানের পর মাচান ফেলে অমৃতর এগিয়ে যাওয়া বড়ো আমি'র রূপান্তর এবং অমৃতর এগিয়ে যাওয়াতে রিকশাখানা ছোট হয়ে যাওয়া আর রিকশার উপর ধুতি পাঞ্জাবি পরে বসে থাকা শ্যামল বাবুকে কুচো পাখির চেয়েও ছোট দেখানো অন্তরের ছোট আমি'র বহিঃপ্রকাশ। সাইকেল রিকসা করে ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দিগন্ত প্লাবন করা নিসর্গ শোভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মনে হয় এই বুঝি ভগবান। যাকে অমৃত দেখতে পায়, শ্যামল বাবু নয়। অমৃতর যে বড়ো আমি'র রূপ বুঝতে পারে শ্যামল গাঙ্গুলি। সাধারণের মধ্যে অসাধারণের কারবার।

জীবনের এই গভীর আলেখ্য ও বাস্তবতাকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পের পরতে পরতে তুলে ধরেছেন। পঞ্চাশ বা ষাট দশকের গল্পকারদের মধ্যে এইভাবেই একটা আলাদা পরিচয় তৈরি করে অনন্য হতে পেরেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচিত মার্জিনের বাইরে গিয়ে আসল মানুষটা কেমন, বাস্তবতায় কীরূপ ধারণ করতে পারে, সেটা দেখাতে চেয়েছিলেন কথাকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পের মধ্যে।

Reference:

১. কবিরত্ন, শ্রীতারাকুমার (সম্পাদিত), 'চাণক্যশ্লোক', জে, এন, বানার্জি এন্ড সন্, কলকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ১৪
২. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি গল্পের ভূমিকা' 'গল্পপাঠ', জুলাই-আগস্ট, ২০১৭
URL - https://www.galpopath.com/2017/07/blog-post_84.html
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৫৯
৪. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'সোনালী দুঃখ', লাইম্ বুকস্, ঢাকা, পৃ. ১১
৫. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১২৭
৬. তদেব, পৃ. ১২৮
৭. দেবভূতি, অনন্য শংকর, 'শ্যামলের গল্পের বিষয় আশয়', 'গল্পসরণি', 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা এক', জয়শ্রী প্রেস, চতুর্বিংশতিতম বর্ষ বার্ষিক সংকলন ১৪২৬/২০২০, পৃ. ৩৫৮
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১৩৯
৯. তদেব, পৃ. ১৭৪
১০. গঙ্গোপাধ্যায়, ইতি, 'আমার শ্যামল', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৩৯
১১. কুণ্ডু, সুরশ্রী, 'শ্যামল আখ্যানের অন্দর-বাহির', 'গল্পসরণি', 'শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা এক', জয়শ্রী প্রেস, চতুর্বিংশতিতম বর্ষ বার্ষিক সংকলন ১৪২৬/২০২০, পৃ. ৩৬৭
১২. তদেব, পৃ: ৩৬৮

১৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'শ্রেষ্ঠ গল্প' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২৬৫
১৪. তদেব, পৃ. ২৬৫
১৫. তদেব, পৃ. ২৬৬
১৬. তদেব, পৃ. ১৬৪
১৭. তদেব, পৃ. ১৬৯

Bibliography:

ভট্টাচার্য বীতশোক, 'গল্পকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়', এবং মুশায়েরা, শারদীয়, ২০০০
হক সাজেদা, 'গল্প নিয়ে আলাপ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প—পরী, 'গল্পপাঠ', পৌষ ১৪২১
URL - https://www.galpopath.com/2015/01/blog-post_10.html